মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির মুখপত্র ● Mouthpiece of Murshidabad Heritage & Cultural Development Society

আগামী সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান ৩০শে জুন, ২০২০ -এর মধ্যে। লেখা পাঠানোর জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুন ঃ- ৯৪৩৪০২১১৫৭।

পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

করোনার বর্তমান পরিস্থিতিতে সকলে বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন।

ত্রৈমাসিক ৪ পাতা | ২ য় বর্ষ - ৬ সংখ্যা ❑ ১১ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৪২৭ সন ❑ ২৫ মে, ২০২০ | মূল্য - ৫ টাকা

সরকারী অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস

সরফরাজ খাঁর সমাধি সংরক্ষণ হোক

স্বপন কুমার ভট্টাচার্য : আলাউদ্দৌলা সাইদারজঙ্গ, নবাব সরফরাজ খাঁ নামে ইতিহাসে পরিচিত। মুর্শিদকুলি খাঁর পৌত্র ও নবাব সুজাউদ্দিন খাঁনের পুত্র। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর স্বল্প সময়কালীন রাজত্বকালে বাংলার স্বাধীনচেতা রাজা ও জমিদারদের তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সাধারণ মানুষ শান্তিতে জীবনযাপন করতেন এবং সাধারণ মানুষ জীবিকা নির্বাহে কোন অসুবিধের সম্মুখীন হননি। কিন্তু নবাব সরফরাজ তাঁর পিতার নির্দেশানুসারে বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী রায়রায়ান আলম চাঁদ, জগৎ শেঠ ও হাজী আহম্মদের গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর পছন্দমত কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রিয়পাত্র করে তোলেন। ফলে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলমচাঁদ, জগৎ শেঠ, ফতেচাঁদ আলিবর্দীকে নবাব করার কৌশল অবলম্বন করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ শেঠ মানিক চাঁদের নিকট গচ্ছিত সাত কোটি টাকা ফতেচাঁদের কাছে ফেরৎ চাইলে ফতেচাঁদ সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কার্য্যে লিপ্ত হন। এদিকে দিল্লীর সম্রাটের বিশ্বস্ত ইসহাক খাঁ নামে এক রাজকর্মচারীকে যথাসাধ্য উৎকোচ ও উপঢৌকন প্রদান পূর্বক গোপনে আলিবর্দী নিজ নামে সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী সহ সরফরাজ খাঁর নিকট থেকে উক্ত সুবাগুলি উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধের অনুমতি আদায় করেন। কারণ

যুদ্ধের অনুমতি আদায় করেন। কারণঃ

নাদির শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাটের সম্মান দিয়ে তাঁর নামে মুদ্রাঙ্কিত মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন। মূলচক্রীরা দিল্লীর সম্রাটের কাছে কর্ণগোচর করলে সম্রাট ক্ষুব্ধ হয়ে আলিবর্দীকে সুবেদারি প্রদান করেন। এদিকে সরফরাজ খাঁর পিতার বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের সমর্থনে আলিবর্দীর সাথে জঙ্গীপুরের কাছে গিরিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ভোরবেলায় নবাব সরফরাজ যখন নামাজ পাঠ করছিলেন আলিবর্দী কৌশলে সেইসময় সৈন্য নিয়ে সরফরাজের শিবির আক্রমণ করেন। নবাব শোনামাত্র শিবির ছেড়ে আলিবর্দীকে প্রতিহত করতে এগিয়ে এলে একটি গোলা অর্তকিতে নবাবের মাথায় আঘাত করে। নবাব হাতির পিঠে হাওদার মধ্যে লুটিয়ে পড়েন। হিজরি ১১৫৩, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে একমাত্র নবাব সরফরাজ খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। সেই দিনই তাঁর পুত্র মির্জা আমানি গভীর রাত্রে গোপনে নবাবের প্রসাদের সন্নিকটে নাটকা খালিতে পিতা সরফরাজের মৃতদেহ সমাহিত করেন। আজকে সাহসী বিক্রমশীল নবাবের সমাধিস্থলের দৈন্যদশা দেখলে খুব দুঃখ হয়। সমাধিস্থলের অনেক জায়গা বেদখল হয়ে গেছে। সমাধি ভেঙ্গে মাটির সাথে প্রায় মিশে আছে। তার মধ্যে সমাধি পড়শীদের ইট, টালি রাখার জায়গায় পরিণত হয়েছে। চারিদিকে জঙ্গল, দোগাছায় ভর্ত্তি। দেখাশোনার কেউ নেই। না রাজ্য সরকার, না কেন্দ্রীয় সরকার। কারোরই কোন হেলদোল নেই। আর এইভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে ইতিহাস - সংরক্ষণের অভাবে। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি-র পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব দপ্তর ও রাজ্য প্রশাসনকে এই সমাধিস্থলের সংরক্ষণের জন্য অনেক লেখালেখি করা হয়েছে - কিন্তু কোনদিনই সদর্থক উত্তর আসেনি। এই নবাবের আর এক কীর্তি সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যা ফৌতি মসজিদ নামে পরিচিত। সাথে সাথে ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও আগামী প্রজন্ম বঞ্চিত হবেন তৎকালীন বাংলার নবাবী ইতিহাস থেকে, তাই অবিলম্বে পরিবীক্ষণ হোক নবাবের সমাধি।

নবাব সরফরাজের সমাধি স্থলকে উদ্ধার করে অবিলম্বে সংরক্ষণের দাবী জানাচ্ছি। সেই সাথে ইতিহাসকে রক্ষা করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান রইল।

ছবি ঃ সনাতন দাস

সম্পাদকীয়

প্রতিবছর ১৮ই এপ্রিল বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস পালন করা হয়। ১৯৮২ সালের ১৮ই এপ্রিল তিউনিশিয়ায় ইন্টারন্যাশানাল কাউন্সিল অফ মনুমেন্টস -এ সোইটিস আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ১৮ই এপ্রিল প্রতি বছর বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৩ সালে দিনটি ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পায়। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিই বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক নিদর্শনের অভাব না থাকলেও বহু স্থান সেভাবে রক্ষণাবেক্ষণই হয়না। দেশের ঐতিহ্যশালী ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য থেকেই আমাদের দেশেও ১৮ই এপ্রিল বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস পালন করা হয়। তবে তার সাথে সাথে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বাঁচানোর জন্য সর্বস্তর থেকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আর সেই আদর্শকে সামনে রেখে প্রতিবছর মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ দিবস অ্যাণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি ১৮ই এপ্রিল হেরিটেজ দিবস উৎসাহের সথে পালন করে থাকে। কিন্তু এবার বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে যে অতিমারী দেখা দেয় তার কারণে, গোটা দেশ করোনার হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য, ২৫শে মার্চ থেকে গোটা দেশব্যাপী লকডাউন শুরু হয়। আর তার জন্যই এবার আমরা আন্তর্জাতিক হেরিটেজ দিবস উদ্‌যাপন বন্ধ রাখি। এ মুহূর্তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য যত শীঘ্র দেশ করোনামুক্ত হোক। কিন্তু এর মাঝে দিন আনি দিন খায় মানুষেরা খুব অসুবিধায় পড়েছে জীবিকাহীন হয়ে পড়ায়। সরকারী সাহায্যের পাশাপাশি আমাদের সংস্থাও এগিয়ে এসেছে এই সহায় সম্বলহীন মানুষগুলোর পাশে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এই ভয়াল করোনা বা কোভিড-১৯ এর হাত থেকে বিশ্ব আবার মুক্তি পাবে। ফিরে পাবে তার পুরনো রূপ। হয়তো সময় লাগবে কিন্তু আমরা আশা রাখি খুব দ্রুত সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। পৃথিবী আবার ফিরে যাবে তার পুরনো ছন্দে।

কলকাতায় মুঘলাই খানা প্রচলনের গল্প

ফারুক আব্দুল্লাহ

কলকাতার অলিতে গলিতে মুঘলাই খানাপিনার দোকান। কলকাতাবাসীও বেশ অভ্যস্ত সেই সব খাবারে। যদিও ফাস্ট ফুডের দাপটে আজ মুঘলাই খানা অনেকটাই কোণঠাসা। তবুও মুঘলাই খানেওয়ালা লোকের কিন্তু অভাব নেই নগরীতে। আজ নগরীর বিভিন্ন প্রান্তে মুঘলাই খানার কিছু দোকান বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। এই সব দোকানগুলির দাবি মতো সেখানে নাকি ঐতিহ্যবাহী মুঘলাই ও অওধি খানা পাওয়া যায়। অওধি খানাও আসলে মুঘলাই খানারই কিছুটা নতুন রূপ।

যাই হোক, কলকাতায় মুঘলাই খানার প্রচলন হয় ঊনবিংশ শতকের প্রায় প্রথম থেকেই। কলকাতায় মুঘলাই খানার প্রচলনে মহিশুরের টিপু সুলতানের পরিবার, অওধের সুলতান, ওয়াজিদ আলি শাহ এবং মুর্শিদাবাদের নবাবরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সে কথা অস্বীকার করার বোধহয় কোন উপায় নেই।

মহীশূরের টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর ইংরেজরা তার ১২ জন পুত্র সহ টিপুর সমস্ত পরিবারকে কলকাতায় নির্বাসিত করা হয়। ঊনবিংশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে অওধের ভাগ্যবিড়ম্বিত সুলতান ওয়াজিদ আলি শাহ লক্ষ্মৌ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। অন্যদিকে বিংশ শতকের প্রায় প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জাও নানান অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতায় জর্জরিত হয়ে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাতে। ফলে এই সব শাসক ও তাদের বংশধরদের কলকাতায় বসবাস শুরু হয়। মজার বিষয় হল দেশের তিন প্রান্তে বসবাস করলেও এদের খাদ্যাভাস প্রায় একই রকমের ছিল। ফলে কলকাতার বুকে মুঘলাই খানার বেশ প্রচলন শুরু হয়ে যায় অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে। এই সব রাজবংশের ছোঁয়ায় স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষজনও মুঘলাই খাবারে অভ্যস্ত হতে থাকলেও মুঘলাই খাবার কলকাতার সাধারণ মানুষদের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই ছিল দীর্ঘ দিন।

কথিত রয়েছে খাদ্যরসিক নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ যখন লক্ষ্মৌ ছেড়ে কলকাতায় আসেন তখন নাকি তিনি সাথে করে প্রায় একশোর অধিক শাহী বাবুর্চি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু নবাবের মৃত্যুর পর নবাবের প্রাপ্য পেনশন বন্ধ হয়ে গেলে অর্থাভাবে নবাবের শাহী বাবুর্চিদের সিংহভাগই চাকরি হারায়। ঠিক এমনই পরিণতি ঘটেছিল মুর্শিদাবাদের নবাবী বাবুর্চিদের ক্ষেত্রেও। মুর্শিদাবাদের তৃতীয় নবাব বাহাদুর ওয়ারিস আলি মির্জার মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে মুর্শিদাবাদের নবাব পদটি দীর্ঘ দিন শূন্য পড়ে থাকে। ফলে অর্থাভাব এবং বাবুর্চিদের কদর করার যোগ্য লোকের অভাবে বহু বাবুর্চি চাকরি হারায়। কলকাতার এই সব চাকরি হারানো বাবুর্চিদের অনেকেই স্বদেশে ফিরে যায়। আবার অনেকে কলকাতাতেই বহু হোটেল ও রেস্টুরেন্টে চাকরি নেয়। কেউ আবার কলকাতাতেই মুঘলাই খানার দোকান খুলে বসেন। এই ভাবেই মুঘলাই খাবার তার আভিজাত্যের গণ্ডি পেরিয়ে কলকাতার সাধারণ মানুষদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে চলে এলে জনসাধারণের সৌভাগ্য ঘটে মুঘলদের রাজকীয় স্বাদ আস্বাদনের।

গৌড়-পাণ্ডুয়ার ভ্রমণ ডায়েরী

(গত সংখ্যার পর)

সহেলী চক্রবর্ত্তী

কদমরসুল

এখানে একসাথে একজায়গায় অনেকগুলো পুরনো ইমারতের সহাবস্থান। একদিকে কদমরসুল, ফতেহ খানের সমাধি। অন্যদিকে চিকা মসজিদ ও গুমটি ফটক। কদমরসুল ১৫৩০ সালে সুলতান নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহ নির্মাণ করেন। মসজিদের আসল বৈশিষ্ট্য হজরত মহম্মদের পায়ের চিহ্ন যা এই মসজিদে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু এখানে এসে আমরা জানলাম যাঁরা মসজিদ ও হজরত মহম্মদের পদ চিহ্ন রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন এতকাল ধরে তাঁরা অত্যন্ত অভাবের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আজকের মুল্যবৃদ্ধির যুগে খুব প্রয়োজনে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই মানুষগুলোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক। তাহলে হয়তো এঁরা বেঁচে যাবে। ফতেহ খান এর বাংলার সাথে সম্পর্ক নিয়ে সমকালীন ইতিহাসে কোন উল্লেখ না থাকলেও ধরে নেওয়া হয়, ফতেহ খানের পিতা দিলির খানের সাথে বাংলায় আসেন তাঁর এখানেই মৃত্যু হয়। সমাধি সৌধটি বাংলার দোচালা কুঁড়ে ঘরের আদলে তৈরী। কদমরসুলের আশপাশে কিছু ভগ্নাবশেষ রয়েছে। মনে করা হয় এগুলো ছিল রাত্রিনিবাস স্থল। কিন্তু আজ কাঠামোর কিছু অবশিষ্ঠাংশ ছাড়া কিছুই আর বেঁচে নেই। এরপর আমরা গেলাম চিকা মসজিদে। বৃষ্টি তখনও হয়েই চলেছে। রাস্তায় জল জমেছে মাঝে মাঝে। মাঠগুলো কাদাকাদা। তবু আমাদের ঘোরার বিরাম নেই। মাঝে একটু চা পানের বিরতি। চা খেতে খেতে সেখানকার মানুষের সাথে আমরা একটু আলাপ জমালাম তাঁদের জীবনযাত্রা, তাঁদের প্রতিদিনের নিত্য লড়াই সম্পর্কে। কথা এগিয়ে চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। এবার ওঠার পালা। চিকা মসজিদ তখন আমাদের ডাকছে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছাতা মাথায় দিয়ে চললাম এবার পরের গন্তব্যের দিকে। সামনে চিকা মসিজদ। নামে মসজিদ হলেও শোনা যায় একে কারাগার হিসাবে নাকি ব্যবহার করা হত। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নাকি সনাতন গোস্বামীকে এখানে বন্দী করে রেখেছিলেন। তবে মিল পাওয়া যায়। চিকা সম্পর্কে আরেকটি তথ্য বলে এটি ছিল বিচারালয়। যার নাম ছিল দিওয়ান-ই মাজ্জালিম। আর নামের পিছনের রহস্য হলো এক সময় এখানে ছিল বহু চামচিকার বাস তাই নাকি চিকা মসজিদ নাম! যাই হোক সামনের বাগানে ভিজতে ভিজতে সামনেই গুমটি দরওয়াজা। এই ফটক নির্মাণ হয়েছিল আলাউদ্দিন হোসেন শাহর আমলে ১৫১২ সালে। ফটক নির্মাণে মূলত ইঁটের ব্যবহার করা হয়। তার সাথে ছিল টেরাকোটার মুগ্ধকর কাজ। মিনাকারী কাজ আজও ফটকের গায়ে ইতিউতি দেখা যায়। শোনা যায় ফটক সাজাতে নাকি সোনার ব্যবহারও করা হয়েছিল! তবে আজ সবই পুরনো গল্পকথা।

বেশ কিছুক্ষণ এখানে থাকার পর আর এখানে থাকা সম্ভব হলনা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি তখনও আমাদের সঙ্গী। রাস্তার দুই ধারে মাঝে মধ্যেই বেশ বড় বড় পুকুর ও দিঘীর দেখা মিলছিল। কাঁচা-পাকা রাস্তা পেরিয়ে আমরা হেরিটেজের পাঁচ সদস্য এবার উপস্থিত হলাম। ফিরোজ মিনারে। পাঁচতলা বিশিষ্ট মিনারের উচ্চতা ৮৫ ফুট। দাখিল দরজা থেকে এর দূরত্ব ১ কি.মি.। মিনার নির্মাণের সময়কাল ধরা হয় ১৪৮৫-১৪৮৯। প্রচলিত কাহিনী হল হাবসী সুলতান সৈফুদ্দিন ফিরোজ এই মিনার নির্মাণ করেন। মিনারের নাম ফিরোজ কেন হল তার পিছনে সুলতান সৈফুদ্দিন ফিরোজের নাম প্রচলিত হলেও আরেকটি তথ্য হল মিনারের গায়ের ফিরোজা রঙের আধিক্য যা আজ দেখা যায়না, তাও হয়তো একটা অবদান রেখেছিল। মিনারের একদম টপে পৌঁছাতে গেলে মোট ৭৩টি সিঁড়ি উঠতে হয়। কিন্তু এখন ভেতরে প্রবেশের কোন উপায় নেই। তাই বাইরে থেকেই ঘোরাঘুরি করতে হল। কি আর করা যাবে। তবে বৃষ্টি কিছুটা ধরে আসায় আমরা এখানে প্রচুর ছবি তুললাম, মিনারের সাথে সাথে নিজেদেরও।

(ক্রমশ)

গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎপাত্র বিলুপ্তির পথে

মাজরুল ইসলাম

(গত সংখ্যার পর)

মাটির তৈরি পাত্র বিশ্বজুড়ে অসংখ্য গ্রামে তৈরি হত। হয়তো এখনও হয়। তবে কৃষ্ণনগরের প্রতিমা এবং বাঁকুড়ার মাটির তৈরি ঘোড়ার খ্যাতি এখনো বিশ্বজোড়া নাম রয়েছে। এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কুমোপাড়ার, ভগবানগোলা, কালোখালি, রায়পুর, তেঁতুলিয়া গ্রামের কুমোরদের উৎকৃষ্ট মাটির পাত্র প্রস্তুতের জন্য সুনাম বহন করছে। কুমোরেরা মাটির বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। যেমন চাকের সাহায্যে, ছাঁচের সাহায্যে ও হাতের সাহায্যে এবং আঙ্গুলের সাহায্যে মৃৎপাত্র গড়ে।

প্রথমে মাটি বাছাই করে। সাধারণত পলি মাটি দিয়েই মাটির বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে থাকে। এই মাটি মূলত আশেপাশের খানা-খন্দ, বিল-খাল, পুকুর ও নদীর পাড় থেকে সংগ্রহ করে। মাটি নিয়ে এসে ভালো করে ঝাড়া হয়। কারণ মাটির সঙ্গে অনেক সময় নুড়ি-পাথর ইত্যাদি থাকে। এগুলি থাকলে মাটির পাত্র নিখুঁত বা মসৃণ করে গড়া যায় না। তারপর মাটি জলে ভিজিয়ে নরম করে সেই কাদা ভালো করে ছানা বা মাখা হয়। এবং মাখা বা ছানা কাদা গোল গোল বা তাল তাল করে কেটে নেওয়া হয়। এই মণ্ডগুলি বিভিন্ন জিনিসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাইজের হয়। এরপর কাদা চ্যাপ্টা করে কৌলিল বা চাকের চাকায় দেওয়া হয়। তখন কুমোর তার হাতের বা আঙ্গুলের গুণে তার চাহিদা মতো মাটির সামগ্রী গড়ে নেয়। পরে নক্সা করা হয়। তারপর রোদে ভালো করে শুকোতে হয়। শুকোনো হলে রাঙা মাটি গুলি পোঁচ দিয়ে রাঙ্গিয়ে নিতে হবে। তারপর ভাটিতে বা পণ-এ সাজিয়ে পুড়িয়ে শক্তপোক্ত করা হয়।

কাঠের চাক ঘুরিয়ে বা পেটানো ব্যবস্থায় কুম্ভকার মাটির যে বাসনপত্র তৈরি করে সেগুলি হলো - হাঁড়ি, লবন রাখা পাত্র, হাঁড়া বা জালা, কলসী, কুঁজো, সানকি, রুটি ভাজা খোলা, চায়ের ভাঁড়, দইয়ের ভাঁড়, নাদ, খুরি, মুড়ি ভাজা খোলা, কুয়োর বা পায়খানার পাট, প্রদীপ, সরা, ধুপচি ও ঘট এবং বাচ্চাদের খেলনা-যাঁতা প্রভৃতি।

যা হোক, যত বেশি পরিমাণে নগরায়ন ঘটছে এবং মানুষের চেনা-জানা জগতের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে তত মাটির তৈরি জিনিসপত্র ভীষণভাবে বিয়োজন ঘটছে। তাছাড়া প্যাস্টিকের পাত্র পাওয়ায় এবং মাটির তৈরি জিনিস ঠুনকো প্রকৃতির তাই লোকে মাটির তৈরি জিনিসপত্র কিনতে তেমন আর আগ্রহী নয়। বাজারে অ্যালুমিনিয়ামের পত্র-পাত্র আসার আগে গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না প্রথার প্রচলন ছিল। মোদ্দা কথা রান্নাশালা মানেই মাটির সামগ্রী চাই। কুমোরেরা মাটির হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি তৈরি করে হাটে-বাজারে ও খেলায় বিক্রি করতে নিয়ে আসত। তাদের জিনিসপত্র মজবুত বা শক্তপোক্ত বোঝাতে ইটের টুকরো দিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করত। সেই শব্দে হাট বা মেলা অন্য মাত্রা পেত। দিনের পর দিন এইভাবে তারা দিনাতিপাত করত।

এখন এই সব ব্যবস্থার পরিবর্তে স্টেনলেস, প্ল্যাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়াম বাজার দখল করে নিয়েছে। ফলে, এই শিল্প বা শিল্পীরা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

(শেষ)

লোকনাট্য আলকাপের সার্দ্ধ শতবর্ষে সম্রাট ঝাঁকশু

কুণাল কান্তি দে

(গত সংখ্যার পর)

ঝাঁকশুর চিন্তাভাবনা যখন বাস্তবে রূপ পাওয়ার প্রাথমিক পর্বে এসে উপস্থিত, ঠিক তখনই বাবা বাবুরাম মণ্ডল ছেলেকে ১৮ বছর বয়সে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। একদিকে সাধনা অন্যদিকে বাঁচার সংগ্রামের নূতন শপথ। বিচলিত হলেন না তবু। দারিদ্র্য এসে বাসা বাঁধল গৃহস্থের বাড়ীতে।

শুরু হল নূতন যুগের ভোর। চরম দারিদ্রতা সত্ত্বেও পিছিয়ে এলেন না আলকাপ থেকে। শুধু চোখে দেখে শেখা সম্ভব নয়, রক্তে ও রন্ধ্রে আলকাপ মেশাতে হলে গুরু দরকার। অনেক খুঁজে জঙ্গীপুর মহকুমার হাঁসুপুরের প্রখ্যাত কবিয়াল বসন্ত সরকারের সান্নিধ্যে এসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দীর্ঘ ৫ বছরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে যখন অনেক এগিয়ে সার্থক শিল্পী হিসেবে দর্শকদের কাছে পরিচিত হয়েছেন ঠিক তখনই বসন্ত সরকারের মৃত্যু ঝাঁকশুকে শোকাহত করল। এতটুকুও না দমে আরো জোরে আঁকড়ে ধরে ধনঞ্জয় সরকার দলের কাছে স্বীকৃতি পেলেন ওস্তাদ 'ঝাঁকশা' হয়ে।

একাই আসরে গান বেঁধে, পদ রচনা ও সুর দিয়ে অনবদ্য অভিনয়ের মাধ্যমে নূতন আস্বাদ ও চমকের সৃষ্টি করলেন। নিজের বংশ পরিচয়ও দিলেন আলকাপের আসরে —

জন্ম যদিও অভাজন চাঁই কুলে
মাতৃভাষা খোট্টাই বুলে
পেশা নগণ্য সব্জী চাষ
মা জাহ্নবী কুলে মোর বাস।'

ছড়ায় বললেন, সাম্প্রদায়িকতার প্রীতি —

'এক থেকে দুই হয়, দেখো বিচার করি
যারে বলে খোদাতাল্লা তারেই বলে হরি
তবে কেন ভায়ে ভায়ে করব মারামারি
বিচার করে দেখুন তবে আসরের নর ও নারী।'

পালাই গাইলেন জীবনের গান। পদ্মার ভাঙ্গনে —

'বেধেছিলাম খেলাঘর ভেসে গেল বানে
থাকিব কোথায় আমি গাইব কেমনে
কেনরে পাষাণ নদী উজানে মারিল ঢেউ
বাঁধিব কি খেলাঘর সে দরদী কেহ নাই
বিধাতা মারিল কলম
আর কেউ রদ হইবে ক্যানে।
পাষাণী হইয়া আজ ডাকি বারে বারে
কোথায় দয়াল প্রভু দেখা দাও মোরে।'

(ক্রমশ)

মধ্যযুগের ইতিহাস কথা — পূর্ববঙ্গের মহাবীর ঈশা খানের স্মৃতি বিজড়িত দুর্গ নগরী স্থান ও সমাধি আজও ইতিহাসের কথা বলে

আমিনুল হক সাদী (বাংলাদেশ)

(গত সংখ্যার পর)

ইতিহাস পর্যালোচান্তে জানা যায়, রাজা টোডরমল সমগ্র বাংলাদেশকে ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেছিলেন। সরকার বাজুহা ও সরকার সোনরগাঁওয়ে দু'টি সরকারের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সরকার বাজুহা ছিল ৩২টি পরগণা ও সরকার সোনারগাঁয়ে ছিল ৫২টি পরগণা। মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁ'র সরকার সোনারগাঁও ও সরকার বাজুহার ২২টি পরগণার এবং ৬টি দুর্গের আধিপত্য গ্রহণ করেছিলেন। যেগুলোর আয়তন ছিল সিলেট জেলার কতক অংশ পশ্চিমে রাজশাহী বগুড়া ও পাবনা জেলার অংশ, দক্ষিণে ঢাকা শহরের বুড়ীগঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত পূর্বে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ভাটি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ড. আ. করিমের মতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব ভাগ ও ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম ভাগ ভাটি রাজ্যের সীমানা। তিনি রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রথমে বিবাড়িয়া জেলার সরাইলে প্রাথমিক রাজ্যের বিস্তৃতি করেন। পরে বর্তমান রূপগঞ্জ উপজেলার মাসুমাবাদ গ্রামে কত্রাবো দুর্গের দখল নিয়ে রাজধানী স্থাপন করেন। মুঘল সুবাদার শাহবাজ খান এ দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত করেন। এমনকি সেখানকার খিজিরপুর দুর্গটিকে বিধ্বংস করে দেন তারা। এ জন্য ঈশা খাঁ মেঘনা নদীর তীরে সুবর্ণ গ্রামে (বর্তমান সোনারগাঁও) রাজধানী স্থাপন করে বিদেশীদের হঠাতে ও মুঘলদের নাস্তানুবাদ করতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলেন। এদিকে সুসংরাজ জানকি নাথ মল্লিকের পুত্র যাকে লক্ষন হাজরা বলে অভিহিত করা হয়। তিনি কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলাধীন জঙ্গলবাড়ী দুর্গ নিয়ন্ত্রণ করে নেন এবং সেখানে ভাটি রাজ্যের একজন অত্যাচারী শাসক হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করে আসছিলেন। মহাবীর ঈশা খাঁ তাই জঙ্গলবাড়ী দুর্গটিকে অধিগ্রহণের জন্য সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে পরাজিত করেন এবং সেখানে বৃহত্তর ভাটি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। জঙ্গলবাড়ী দুর্গের প্রাচীন স্থাপত্য আজ আর অবশিষ্ট নেই। মূল দুর্গের বাহিরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বা এর পরের যে স্থাপনাগুলো আজও কালের স্বাক্ষী

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

▸ ৩ পৃষ্ঠার পর

পূর্ববঙ্গের মহাবীর ঈশা খানের স্মৃতি বিজড়িত দুর্গ নগরী স্থান ও সমাধি আজও ইতিহাসের কথা বলে

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনো সময় তাও ভেঙ্গে যেতে পারে। হাবেলীর অভ্যন্তরের প্রাচীন কোনো স্থাপত্য মাটির ওপরে অবশিষ্ট নেই। দুর্গাভ্যন্তরে আগাছা জন্মে ভুতুরে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ঈশা খাঁ'র ১৪ তম পুরুষ দেওয়ান আমিন দাদ খান বলেন, হাবেলী দুর্গের অভ্যন্তরের দালানগুলো ১৩১৬ সনের ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। জঙ্গলবাড়ী দুর্গ অভ্যান্তরে কি ধরনের প্রাচীন স্থাপত্য ছিল তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে যদি সমগ্র দুর্গ এলাকাটি খনন কার্য করা হয়। *(ক্রমশ)*

বেণীপুরের রাজা বেণীমাধব

(গত সংখ্যার পর) **গোপাল মণ্ডল**

আরো একটু এগিয়ে রাস্তার বাম দিকে মানে দক্ষিণ দিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা যায় লম্বা ভাবে। পাশ ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে একটি লম্বা পুকুরও দেখা যায়। এই জায়গাকে সন্ন্যাসীতলা বলে। কোনো এক সময়ে একজন সন্ন্যাসী এই স্থানে আড্ডা জমিয়েছিলেন। সেই থেকে এই জায়গার নাম সন্ন্যাসীতলা। এখানে একটি নব নির্মিত শিব মন্দির দেখা যায়। মন্দিরের সামনে নাটমন্দির তৈরী হতে দেখা যাচ্ছে। পাশে পুরোনো দিনের দু-তিনটি তমাল গাছ দেখা যায়। বাকি অংশে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করে ও অন্যান্য কাজে জায়গাটি ব্যবহার হয়। কোনো প্রকার প্রাচীন নিদর্শন বা চিহ্ন এখানে চোখে পড়ে না।

আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে রায় পাড়া। এখানে রাস্তার উত্তর দিকে মাঠের ধারে আছে রানীদীঘি। নাটোরের রাণী ভবানী এই দীঘি খনন করেছিলেন এলাকার লোকেদের জল কষ্ট নিবারণের জন্য। এই জন্য নাম রানীদীঘি। দীঘিটি বেশ বড়ো ও গভীর। জল টলটলে স্বচ্ছ। রানীদীঘির দক্ষিণ দিকে পুরানো আমলের চুন সুড়কি ও ইট দিয়ে ঘাট বাঁধানো দেখা যায়। কিন্তু ভগ্নাদশায় রয়েছে। এই ঘাটের উপরে পূর্ব দিকে আগে নাকি একটি শিব মন্দির ছিল। তবে এখন কোনো শিব মন্দির বা শিবলিঙ্গ'র কোনো চিহ্ন নেই। তার বদলে আছে একটি ফুল গাছ। স্থানীয়রা তাকেই মন্দির বলে। পুকুরের পশ্চিমপাড়েও বাঁধানো ঘাটের চিহ্ন দেখা যায়। লোকেরা আগে এই ঘাট ব্যবহার করত। এখন জঙ্গলে ঢেকে আছে ও ভেঙ্গে চুরে জল-মাটিতে মিশে গেছে। লোকমুখ ও গবেষণাপত্র থেকে জানা যায়, রানী ভবানী বড়নগর রাজবাড়ী থেকে ঝুমকা নদী দিয়ে এই রানীদীঘিতে আসতেন। স্নান করে শিব পূজা করে নৌকা যোগে মাঝে মাঝে যেতেন কিরীটেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে। আবার ফিরে আসতেন বড়নগরে একই পথে। ঝুমকা নদী বা ক্যানেল রানীদীঘির পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। বর্তমানে ঝুমকা নদীর করুণদশা। *(ক্রমশ)*

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের "মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি"-র মুখপত্র ইতিহাসের অলিন্দে বর্ষপূর্তিতে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল আমায়ণ অনুষ্ঠান বাড়ী, সদর ঘাট, মুর্শিদাবাদ শহর। সেই অনুষ্ঠানে কিছু বিশেষ মুহূর্ত।

বন্যেশ্বর শিব মন্দির

সনাতন দাস

(গত সংখ্যার পর)

গত ২৫শে আগষ্ট ২০১৯, রবিবার, আমাদের সংগঠন মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক মাননীয় স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় আমি, অর্ণব রায়, চন্দন মণ্ডল, সুশান্ত সিনহা, পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছেছিলাম কিছু জানা অজানা ইতিহাসের অনুসন্ধানের পিপাসায়। প্রথমে সাগরদীঘি দেখে রওনা হলাম সেখের দীঘির উদ্দেশ্যে। সেখের দীঘি দেখার পর সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে গ্রামের সুন্দর নির্মল পরিবেশ ও রাস্তার দুই ধারের সবুজ ধানের ক্ষেতের শোভিত দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করেছে এবং সাদা কাশফুল স্নিগ্ধ বাতাসের দোলায় শরৎকে আহ্বান জানাচ্ছে।

এমন সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম আমরা বন্যেশ্বর গ্রামে। এখানেই বিরাজ করছেন বাবা বন্যেশ্বর, তাঁর নাম অনুসারেই এই গ্রামের নাম হয়েছে বন্যেশ্বর।

বীরভূম জেলার সীমান্তবর্তী পুরাতন বাদশাহী সড়কের অদূরে অবস্থিত বন্যেশ্বর গ্রাম। নাতিউচ্চ প্রাচীন ধ্বংসাবশের ঢিবিতে চারচালা রীতিতে নির্মিত সুউচ্চ শিব মন্দির। ঢিবির চারিধারে বিক্ষিপ্তভাবে গুপ্ত যুগের পুরাতন ছোট ছোট বাংলা ইট দেখা যায়। কৃষ্ণমসৃণ লোহিত, ধূসর নানা বর্ণের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশও ছড়িয়ে আছে ঢিবির উপরে। শিব মন্দিরের পশ্চিমে বহু পুরোনো বটবৃক্ষ ও তার নিচেই একটি নবনির্মিত লাল রংয়ের বেদিতে প্রস্তরখণ্ড চোখে পড়ে, প্রস্তরখণ্ডটি প্রাচীন স্থাপত্য বা কোন এক সৌধের অংশবিশেষ বলেই মনে হয়। মন্দিরের পূর্বদিকেও একটি নব বটবৃক্ষের তলে ছোট বড় প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়, এগুলিও এক বৃহদাকার প্রস্তর মূর্তির ভাঙা অংশ, তার মধ্যে একটি উমা মহেশ্বরের মূর্তির ভগ্নাংশ দেখা যায়। মন্দিরের পূর্বে নবনির্মিত একটি অতিথিশালা (যাত্রী নিবাস) দেখা যায়। এর থেকে বোঝা গেল এই বন্যেশ্বর শিব মন্দির দর্শনে বহিরাগত ভক্তদের সমাগম হয়। একটি নবনির্মিত উত্তরমুখী মন্দির দেখা যায়, আজ থেকে অর্ধশত বৎসর পূর্বে এখানে এক সন্ন্যাসী পেরিদাস বাবাজি বন্যেশ্বর শিব মন্দিরের দেখাশোনা করতেন। পেরিদাস বাবাজির মৃত্যুর পর এই স্থানে সমাধিস্থ করা হয়, এটি তার স্মৃতি মন্দির।

বন্যেশ্বর শিব মন্দিরের সম্মুখে একটি বেলে পাথরের যূপকাষ্ঠ দেখা যায়, যা পশুবলি দিতে কাজে লাগে, কিন্তু শিব মন্দিরের সম্মুখে এটিকে দেখে অবাক হলাম, বিশেষতঃ কালী মন্দিরে যূপকাষ্ঠ দেখা যায়। মূল মন্দির সংলগ্ন দধিসাগর নামের জলাশয় বন্যেশ্বর গ্রামের শোভাবর্ধন করে চলেছে। চুন সুরকির গাঁথনিতে পুরাতন বাংলা ইটের তৈরী প্রাচীন আমলের বাঁধানো ঘাটটি বৎসরের অধিকাংশ সময় জলের তলায় নিমজ্জিত থাকে। বাবা বন্যেশ্বরের সহৃদয় ভক্তরা একটি সম্প্রতি স্নান করার বাধানো ঘাট নির্মাণ করে দিয়েছেন। মূল মন্দিরটিও হালেই পুনঃসংস্কার ও রং করা হয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি কালো পাথরের বহু পুরোনো শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছে, মন্দির মেঝে থেকে খানিকটা পাতালে শিব লিঙ্গটি অবস্থান করছে। এটাই বাবা বন্যেশ্বরের শিবলিঙ্গ। এই মন্দির ও শিবলিঙ্গ কে বা কারা কত বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন তার কোন শিলালিপি বা কোন লেখা গ্রন্থে উল্লেখ নাই। বন্যেশ্বর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার বহুকাল আগে থেকেই এখানে বসবাস করছেন, তারাই এই মন্দিরের বর্তমান দেখাশোনা করেন। *(শেষ)*

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০ "মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি"-র উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ শহরের মোতিঝিলে আয়োজিত পারিবারিক সদস্যদের বনভোজনের চিত্র।

E-mail : sbhattacharyya479@gmail.com

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য (৯৪৩৪০২১১৫৭), মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক - ফারুক আব্দুল্লাহ (৯৪৩৪৬৪৪০৮৯), সহ-সম্পাদিকা - সহেলী চক্রবর্তী (৮৯৪২৯২৪২৩৪), সম্পাদকমণ্ডলী - অপূর্ব কুমার সেন, অর্ণব রায়।
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ শ্রী পঞ্চানন চক্রবর্তী। অক্ষর বিন্যাস - শুভ্রজ্যোতি তালুকদার (৯৭৩৪৩১৪৫৬৮)। মুদ্রণে - মেসার্স কিস্ অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ